Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:77
January-March, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-02.28
Published: 2024-06.05

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i77.267

Mineral Resource Utilization Policy in Islamic and Conventional Law : A Comparative Review

Md. Burhan Uddin*

Abstract

Natural resources have contributed significantly to the development of modernity and civilization of the world. There are huge reserves of these minerals in different regions and countries. Economic development and prosperity will surely come if a fair approach is adopted in its exploration, discovery, extraction and balanced use as well as distribution. Although the Muslim world has a large reserve of mineral resources, they are backward in many ways in terms of socio-economic development. Due to the socio-economic condition, geo-political location and lack of technical capacity of the underdeveloped and developing countries, it is not possible to extract different minerals despite the demand. In that case, developed countries and multinational corporations are extracting and commercializing resources on a partnership or profit basis. However, the people of these countries are not able to enjoy their own country's resources easily and equitably. As a result, it has an adverse effect on socio-economic development. Islam has provided different instructions for the overall improvement of humankind. This article has discussed the principles of mineral resource utilization in the light of Islamic and conventional law. Premising on descriptive and comparative manner, this study has ventured to present a description, elucidation and effectiveness of the Islamic principles and Conventional laws on mineral resources. This article has substantiated that if mineral resources are extracted and utilized through fair distribution of resources according to Islamic guidelines, it will be able to play a more effective role in the overall development of the country including poverty alleviation.

Keywords: Mineral Resources, Mining, Mineral Law, Ownership in Islam, Marine Resources.

* Md. Burhan Uddin, Islamic Researcher and Essayist, Kafrul, Dhaka. email: rpgclburhanuddin@yahoo.com

ইসলাম ও প্রচলিত আইনে খনিজ সম্পদের ব্যবহার নীতি একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর আধুনিকতা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রাকৃতিক সম্পদভুক্ত খনিজ সম্পদ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। বিভিন্ন দেশে রয়েছে এ খনিজ সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। এর অনুসন্ধান, আবিষ্কার, আহরণ, উত্তোলন এবং সুষম ব্যবহার-বণ্টনে ন্যায়ানুগ পন্থা অবলম্বন করা হলে নিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসবে। অথচ মুসলিম বিশ্বের মালিকানাধীন বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ থাকলেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তারা আজ নানাভাবে অনগ্রসর। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের অভাব থাকায় চাহিদা সত্ত্বেও অনেক খনিজপদার্থ আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহ এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো অংশীদারত্ব কিংবা লাভজনক ভিত্তিতে সম্পদ আহরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করছে। তবুও, এসকল দেশের জনগণ নিজের দেশের সম্পদ সুলভ ও সুষমভাবে ভোগ করতে পারছে না। ফলে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ইসলাম মানবজাতির সার্বিক উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলাম ও প্রচলিত আইনে খনিজ সম্পদের ব্যবহার নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণনামূলক এবং তুলনামূলক পদ্ধতিতে রচিত প্রবন্ধটিতে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ইসলামী নীতি ও প্রচলিত আইন-বিধির বিবরণ, বিশ্লেষণ ও কার্যকারিতার বিষয়ে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের মাধ্যমে খনিজ সম্পদ আহরণ, উত্তোলন ও ব্যবহার করা হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অধিক ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মূলশব্দ : খনিজ সম্পদ; খনি; খনিজ আইন; ইসলামে মালিকানা; সমুদ্রসম্পদ

ভূমিকা

ইসলাম পরিপূর্ণ ও শাশ্বত জীবনবিধান হওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তার স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। অন্যান্য সম্পদের মতই ইসলাম প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে। আল্লাহ তাআলা মানব সভ্যতার প্রয়োজন, স্থিতি ও প্রগতির জন্য এ পৃথিবী সম্পদরাজি দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে জলে-স্থলে, ভূ-পৃষ্ঠের অতল গভীরে অসংখ্য মহামূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে। তেমনি সমুদ্র-গর্ভে রয়েছে অসীম পরিমাণ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ। মূলত জলে-স্থলে অগ্নি-বায়ু-পানি সম্পদ, মৎস্য, পাহাড়-পর্বত, প্রাণিজগৎ, বনজ সম্পদ, নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস, কয়লা, শিলা, লোহা, হার্ডরক, চুনাপাথর, বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান বালি, হীরক, গ্রানাইট, জৈব পদার্থ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এসবের পরিমাপ করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানবজাতি তার প্রয়োজনেই খনিজ সম্পদ আহরণ, উত্তোলন, মজুত এবং ব্যবহারে সচেষ্ট হয়।

জীবনের তাগিদেই আল্লাহর এ অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করার জন্য মানুষ নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা চালায়। তবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ-কে আমানত হিসেবে সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায়ানুগ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীর সবকিছু মানবজাতির উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। নবী করীম ﷺ মাটি-বায়ু-আগুন, ফসলরাজি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ, প্রাণিসম্পদ, বনজ ও ফলদ সম্পদ সংরক্ষণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামী মৌলনীতির ভিত্তিতে এ সকল সম্পদের মধ্যে বিশেষত খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ, আবিষ্কার, আহরণ-উত্তোলন এবং যথাযথ ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে মানবজাতি উপকৃত হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

খনিজ সম্পদের যাকাত নিয়ে ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গীতে ফকীহগণ নানাবিধ বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী গবেষকদের রচনার মধ্যে ড. ইউসুফ আল কারযাভী রহ. রচিত 'ফিকহুয যাকাত' গ্রন্থ অন্যতম। এ গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে খনিজ ও সমুদ্র সম্পদের যাকাত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আবু উবায়েদ আল কাসিম ইবনু সাল্লাম রচিত 'কিতাব আল আমওয়াল' সহ এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এসব গ্রন্থে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন রচিত 'ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ', মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম-এর 'ইসলামের অর্থনীতি' এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি তত্ত্ব' গ্রন্থে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া, প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থ সাইয়িদ সাবিক-এর 'ফিকহুস সুন্নাহ', বুরহানুদ্দীন আল মারগিনানী-এর 'আল হিদায়াহ' গ্রন্থে খনিজের যাকাত বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থসমূহে খনিজ সম্পদ, প্রোথিত সম্পদ, সমুদ্র সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ গবেষণায় খনিজের যাকাত সম্পর্কে আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ খনি ও খনিজ সম্পদ আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

খনিজ সম্পদের পরিচয়

সাধারণত কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে খনিজ বলা হয়। খনিজের প্রকৃত সংজ্ঞা বের করা কঠিন। তবে, স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট এবং কেলাসিত (crystalized) এমন একটি সমসত্ত্বের অজৈব পদার্থ যার একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক মিশ্রণ এবং একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পারমাণবিক গঠন থাকে, তাকে খনিজ বলা হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে খনিজের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়সহ এর বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন উপাদানসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

- **আভিধানিক অর্থ**

'খনিজ'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে খনি থেকে পাওয়া যায় এমন, খনিজাত, আকরিক (Choudhury 2016, 359)। ইংরেজিতে বলা হয় Mineral, অর্থ- মাটি খুঁড়ে প্রাপ্ত নৈসর্গিক পদার্থ (উদ্ভিদ বা প্রাণী নয়) বিশেষ, যেসব পদার্থের রাসায়নিক গঠন অপরিবর্তিত থাকে, খনিজ, আকরিক (Siddiqui 2012, 474)।

আরবি-ইংরেজি অভিধান 'আল মাওরিদ' গ্রন্থে রয়েছে : খনিজের আরবি المعدن। বহুবচনে المعادن। এর অর্থ Mineral, Metal, Metallic। বলা হয়ে থাকে مياه معدنية অর্থ: Mineral Water

দীর্ঘস্থায়ী কোনো খনি থেকে প্রাপ্ত ধনসম্পদ বা রত্নভাণ্ডারকে معدن বলে। যেমন, সোনা-রূপা, লোহা, তামা, সীসা, ইয়াকুত, আকীক, সুরমা, পেট্রোল, বারূদ, কয়লা ইত্যাদি (al-Ba'alabakī 1993, 593 & 1069)।

ইংরেজি-আরবি অভিধান 'আল্ মাওরিদ' গ্রন্থে Mineral এর আরবি করা হয়েছে المعدن (al-Ba'alabakī 1994, 580)। খনিজকে আরবিতে الكنز-الركاز - المعدن। বলা হয়। তবে, الركاز ও الكنز। একই কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। كنز শব্দটির বহুবচন كنوز অর্থ: পুঞ্জিভূত করে রাখা, গোপনে গচ্ছিত রাখা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

আর যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না বা যাকাত দেয় না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (al-Qur'ān, 9:34)

الركاز। শব্দটি ركز শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ: গোপনে কথা বলা, ফিসফিস করা। কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

তাদের আগেও আমি বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এদের কোনোরকম অস্তিত্ব কি তুমি এখন অনুভব করো, নাকি শুনতে পাও এদের কোনো ক্ষীণতম শব্দ (al-Qur'ān, 19:98)

ইমাম তিরমিযী (মৃ. ২৭৯ হি.) রহ. বলেন,

وَالرِّكَازُ مَا وُجِدَ فِي دَفْنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. فَمَنْ وَجَدَ رِكَازًا أَدَّى مِنْهُ الْخُمُسَ إِلَى السُّلْطَانِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَهُ

জাহিলী যুগে মাটির নীচে পুতে রাখা সম্পদকে রিকায বলা হয়। কোন লোক যদি এই সম্পদ পায় তবে এর এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে প্রদান করবে আর বাকি অংশ তার নিজের। (al-Tirmidhī 2015, 1377)

'আল কামূস' গ্রন্থে 'রিকায' অর্থ করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যা সঞ্চিত করে রেখেছেন অর্থাৎ খনির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন; আর ইসলাম পূর্বযুগের প্রোথিত সম্পদ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য খণ্ডাকারে গচ্ছিতকে খনিজ সম্পদ বলা হয়। ইবনুল আসীর

(১১৬০-১২৩৩ খ্রি.) 'আন্ নিহায়াহ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রিকায' হিজাযবাসীদের মতে ইসলাম পূর্বযুগের লোকানো ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ। আর ইরাকবাসীদের মতে খনিজ সম্পদ। দুইটি অর্থই ভাষাসম্মত। কেননা এ দুইটি মাটির তলায় স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত। 'আল্ বাদাইউ' গ্রন্থকার আলাউদ্দিন আল কাসানী (মৃ. ১১৯১ হি.) বলেন, 'রিকায' ركز হতে এসেছে। অর্থ 'প্রতিষ্ঠিত করা'। আর যা খনিতে থাকে তা জমির গর্ভে প্রতিষ্ঠিত। তা জমাকৃত বা 'কানয্' নয়। কেননা তা জমির সাথে প্রতিবেশী হয়ে থাকার মত রক্ষিত হয়েছে। (al-Qarḍāwī 2013, 1:395)।

▪ খনিজ সম্পদের পারিভাষিক সংজ্ঞা

ভূতত্ত্ববিদগণ খনিজ সম্পদকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। *Glossary of Geology* গ্রন্থে খনিজের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

> Mineral as a naturally occurring inorganic element or compound having an orderly internal structure and characteristic chemical composition, crystal form, and physical properties.
>
> খনিজ হলো প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট মৌলিক অথবা যৌগিক উপাদান, যা নিয়মিত অভ্যন্তরীণ গঠন এবং বৈশিষ্ট্যমত রাসায়নিক পরিমাণ, স্ফটিক গঠন এবং ভৌতিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। (Bates & Jackson 1980, 751)

ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন, খনিজ হলো প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত স্ফটিক আকারের কঠিন বস্তু, সাধারণত অজৈব, সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্বারা গঠিত। তারা আরও বলেন, কোনো বস্তুকে খনিজ হিসেবে গণ্য করতে হলে অবশ্যই সেটিকে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পেতে হবে। কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত হীরক বা রসায়নবিদগণ কর্তৃক গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হাজার হাজার একই ধরনের উৎপন্ন দ্রব্যকে খনিজ বা মণিক হিসেবে গণ্য করা যায় না (Lahiry 2009, 62-63)।

বাংলাদেশের 'খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন, প্রকাশ ১ নভেম্বর ১৯৯২) অনুযায়ী 'খনিজ সম্পদ' অর্থ: এমন বস্তু যা সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে ভূত্বকের অংশ হিসেবে পাওয়া যায় বা ভূত্বকের মধ্যস্থিত বা উপরিস্থ পানিতে দ্রবণীয় বা নিলম্বিত থাকে বা উক্তরূপ বস্তু হতে নিষ্কাশন করা যায় এমন বস্তুকে বুঝাইবে এবং সিরামিক, রিফ্রেক্টরি ও শোষণক্ষম সম্বন্ধীয় জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত ক্লে; রাসায়নিক জিনিস ঘষামাজা ও ঢালাই করার বালুর জন্য ব্যবহৃত সিলিকাবালুসহ সিলিকা (silica); অক্ষত, খণ্ডিত ও স্লাব আকারে ব্যবহৃত বালু, নুড়িপাথর বা শিলা; সকল প্রকার চুনাপাথর; পিটসহ সকল প্রকার কয়লা; কয়লা বা শেইল (shale) খনন, নিষ্কাশন বা উৎপাদন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং কয়লা খনন কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় মিথেন (methane) গ্যাস; এবং কয়লা বা শেইল প্রাপ্তিস্থানে উক্ত পদার্থের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে নিষ্কাশিত বা উৎপাদিত খনিজ তেল বা গ্যাস।

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ প্রদত্ত মাটি বা ভূমির অভ্যন্তরে কতগুলো মৌলিক উপাদান পরস্পর মিলিত হয়ে যে সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত সম্পদরাজি বা যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে তাই খনিজ সম্পদ। সাধারণভাবে বলা যায়, মাটির তলদেশ বা খনিতে মজুতকৃত সম্পদকে খনিজ সম্পদ বলে।

▪ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য

ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো খনিজে কেবল একটিমাত্র মৌলিক উপাদান থাকে, যেমন, রূপা, সোনা, তামা, হীরা, গন্ধক ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ খনিজই দুই বা ততোধিক মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত থাকে। কোনো একটি খনিজকে তার রং, কাঠিন্য, আপেক্ষিক গুরুত্ব, খণ্ডায়ন বা ফাটল, রাসায়নিক মিশ্রণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চেনা যায়। আবার পৃথিবীতে অসংখ্য খনিজ পদার্থ রয়েছে যাদের প্রত্যেকের এক একটি নিজস্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে (Chowdhury 1996, 79)।

খনিজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, খনিজকে অবশ্যই প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ হতে হয়। কঠিন ও স্ফটিকাকার এবং অজৈব পদার্থ হতে হয়। খনিজ সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদান সমৃদ্ধ। সব শিলাই খনিজ দ্বারা গঠিত হয়, কেননা শিলা বা পাথরের মূল উপাদান হলো খনিজ। ফলে জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পৃথকভাবে শনাক্ত হয়। তাপমাত্রা, চাপ ও রাসায়নিক পরিবেশ দ্বারা খনিজের ধরন নির্ধারিত হয় (Lahiry 2009, 62)। ভূতত্ত্ববিদগণ খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, খনিজ সম্পদের সঞ্চয়ের পরিমাণ সীমিত। পৃথিবীর সর্বত্র খনিজ সম্পদের স্থিতি ও পরিমাণ সুষম নয়। ভূত্বকের গঠনের তারতম্যের জন্যই খনিজ সম্পদের এ অসম বিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবহার প্রকৃতির দিক থেকে খনিজ সম্পদ শিল্পের উন্নতির জন্য কাঁচামাল কিংবা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনবায়নযোগ্য খনিজ সম্পদ একবার শেষ হলে তা আর পাওয়া যায় না। যেমন: কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লোহা প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো খনিজ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য পারদর্শী প্রযুক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপুল পরিমাণ উত্তোলন ব্যয় হয়। আবার কখনো উত্তোলনের অভাবে খনিজ সম্পদ মাটির অভ্যন্তরেই রয়ে যায়। শিল্পের উৎকর্ষের ফলে খনিজ সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। জনগণের চাহিদা বিবেচনায় সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য খনিজ সম্পদ সীমিত পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়।

▪ খনিজ সম্পদের ধরন ও প্রকারভেদ

ইসলামের আলোকে খনিজ সম্পদের প্রকারভেদ ও ধরন সম্পর্কে নানা বিশ্লেষণ রয়েছে। ইমাম মালিক রহ. এর মতে খনিজ সম্পদ দুই ধরনের:

ক) খনিজ সম্পদ উৎপাদনে যথেষ্ট শ্রম বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

খ) খনিজ সম্পদ আহরণে শ্রম প্রয়োজনীয় নয়। (al-Qarḍāwī 2013, 1:382)

ভূগর্ভে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের ব্যবহারের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন:

এক. ধাতু (Metal)

এটা দুই ধরনের হতে পারে। যথা:

১. মূল্যবান ধাতু (Precious metal), যথা; সোনা, রূপা, প্লাটিনাম প্রভৃতি
২. মৌলিক ধাতু (Baso metal), যথা: লোহা, তামা, দস্তা, সীসা, টিন, পারদ, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, টাংস্টেন, অ্যান্টিমনি, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি।

দুই. অধাতু (Non metal)

অধাতু খনিজের মধ্যে রয়েছে: গন্ধক, গ্রাফাইট, লবণ, মূল্যবান প্রস্তর, অ্যাসবেস্টস, বাড়ি নির্মাণের প্রস্তর, কয়লা,পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি (Mukhopadhya 1360 B, 115)।

- **খনিজের সংখ্যা**

এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ অপরিমেয় খনিজ সম্পদ দান করেছেন। এসব খনিজ সম্পদ আল্লাহর অপার নিয়ামত। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না। খনিজের সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ বিষয়। পবিত্র কুরআনে নিয়ামত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

যদি আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (al-Qur'ān, 16:18)

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭ খ্রি.) তাঁর বিখ্যাত 'স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থে লিখেছেন, মহান আল্লাহ ভূত্বকে খনিজ দ্রব্য শামিল করে দিয়েছেন। এতবেশি সংখ্যক যে, তা গণনা করা অসম্ভব। তবে, দ্রব্যের যে সংখ্যা এ পর্যন্ত জানা গেছে তা ২০০০ প্রকারের। এ থেকে মহান আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল ও কুদরতের অসীমতাই প্রমাণিত হয়। এসব তিনি করেছেন এই ভূপৃষ্ঠের মানুষের বাসোপযোগী বানানোর লক্ষ্যেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, এই দুই হাজার প্রকারের উপাদান একটি অপরটি হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বহু ভূগোলতত্ত্ববিদ কয়লা, তেল, পীতাভ তেল স্ফটিক বিশেষ অম্বরকেও খনিজ পদার্থ বলেছেন। খনিজ গড়ে ওঠে মূল্যহীত ধাতু (Non Precious Metal) দিয়ে। তা সত্ত্বেও ৯৩টি পরিচিত উপাদান এখন পর্যন্ত জানা গেছে। কেননা মাত্র ৯টি উপাদানই এমন যার বিভিন্ন একক হাজারের মধ্যে ৯৯% প্রস্তর ভূত্বক নির্মাণে লেগেছে। তার মধ্যে বিপুল হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র। কিন্তু তা আয়ত্তে এনে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করা মোটেই সহজসাধ্য নয় (Rahim 2007, 352-53)। সাধারণভাবে এখনও পর্যন্ত কয়েক হাজার খনিজের নাম জানা গেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ সচরাচর মাত্র ৩০টি খনিজের নাম বিবেচনা করে থাকেন। এ খনিজগুলোই অধিকাংশ ভূত্বকীয় শিলা গঠন করে থাকে বলে এগুলোকে 'শিলা গঠনকারী খনিজ' (rock forming minerals) বলা হয়। উক্ত ৩০টি খনিজের মধ্যে মাত্র ১০টি মৌলিক পদার্থ ৯৯% ভূত্বক গঠন করে। মৌলিক পদার্থগুলো হলো অক্সিজেন (৪৬.৬%), সিলিকন (২৭.৭%), অ্যালুমিনিয়াম (৮.১%), লৌহ (৫.০%), ক্যালসিয়াম (৩.৬%), সোডিয়াম (২.৮%), পটাশিয়াম

(২.৬%), ম্যাগনেশিয়াম (২.১%), টাইটেনিয়াম ০.৪% এবং হাইড্রোজেন ০.১%) (Lahiry 2009, 63)।

বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী ও মূল্যবান ১০টি খনিজ দ্রব্য হলো- ব্ল্যাক ওপাল, প্যানাইট, রোডিয়াম, গোল্ড, জ্যাডিটি, ডায়মন্ড, লিথিয়াম, প্ল্যাটিন্যাম, রুবিস ও ব্লু-গারনেট।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব

ইসলামে খনিজ সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। অধুনা কোনো দেশের অর্থনীতিতে খনিজ আহরণ, উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেসব দেশে জ্বালানি ও খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ সেসব দেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর উন্নয়নে ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। মাটির অতল গভীরে বিবিধ প্রকার মহামূল্যবান খনিজ দ্রব্যের স্তুপ স্বাভাবিকভাবেই পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এর পরিমাপ করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের জৈব জীবনের জন্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থ মাটির সাথে মিশে আছে। এমনকি মানবসভ্যতার জন্য অত্যাবশ্যক লোহা, তামা, পিতল, ইস্পাত, সোনা, রূপা, হীরা-মাণিক্য, পেট্রোল-জ্বালানি ইত্যাদি দ্রব্যাদি মানুষ খনিজ হতেই লাভ করে।

বর্তমান এ আধুনিক যুগে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যে কোনো শিল্পের শক্তির উৎস হিসেবে জ্বালানি ও খনিজের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার কোনো কোনো খনিজ দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর যে দেশ খনিজসম্পদে যতবেশি সমৃদ্ধ সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ততবেশি ত্বরান্বিত হয়। তবে, খনিজসম্পদে ভরপুর থাকলেও তা যদি মানবকল্যাণে আহরণ, উত্তোলন ও ব্যবহার সঠিকভাবে করা যায় তাহলেই কেবল এর উপকারিতা পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾

তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। (al-Qur'ān, 31:20)

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের (মানুষ) জন্যই সৃষ্টি করেছেন... (al-Qur'ān, 2:29)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এ পৃথিবীকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর এতে যা রয়েছে তাও কল্যাণের জন্য।

১. বিস্তারিত দেখুন :https://steemit.com/money/@reno7/the-10-most-expensive-minerals-in-the-world

ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে রয়েছে জানা-অজানা, চিহ্নিত-অচিহ্নিত বিবিধ সম্পদরাজি ও খনিজ পদার্থ। এজন্য সমগ্র যমীনকে আল্লাহ একরকম বানিয়ে রাখেননি। বরং তাতেও বিভিন্ন অঞ্চল ও এলাকা বানিয়ে রেখেছেন, যা পরস্পর মিলিত সংযোজিত হওয়া সত্ত্বেও রূপে, বর্ণে, উপাদানে, বিশেষত্বে, উর্বরা শক্তিতে, যোগ্যতা বা উপযোগিতা, ফসল কিংবা রাসায়নিক কিংবা খনিজ সম্পদের দিক থেকে পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ও প্রকারের। এসব সম্পদরাজি হলো আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত। আর তা অন্বেষণ করা, সংগ্রহ করা, রিযিকের অনুসন্ধানে বের হওয়া সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

ইসলামের দৃষ্টিতে খনিজ সম্পদের মালিকানা

ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে খনিজ সম্পদের মালিকানা বিষয়ে বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ইসলামে মালিকানার ধারণা বা স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা প্রয়োজন। ধন-সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক ঘোষণা হলো, আল্লাহ তাআলা এ আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত এবং যমীনের অভ্যন্তরে ও উপরিভাগে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক এবং অধিকর্তা। পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও যাবতীয় কল্যাণকর উপকরণ-সামগ্রী যত কিছুর অস্তিত্ব আছে, মাটি, জমি, নদী-সমুদ্র, পানি, সূর্য-তাপ যা কিছুই হোক-সব কিছুই নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো সমতুল্য নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এ মালিকানায় কারও কোনো শরীকও নেই। এ ব্যাপারে আল কুরআনের বক্তব্য স্পষ্ট। যেমন, আল্লাহর বাণী:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

আকাশমণ্ডল ও যমীনের মালিকানা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। (al-Qur'ān, 42:49)

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহর জন্য, আল্লাহর মালিকানাধীন। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (al-Qur'ān, 2:284)

ইসলামে মালিকানার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- ইসলামে সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ। মানুষ তাঁর খলীফা হিসেবে আমানতদার মাত্র।
- সম্পদের ওপর ব্যক্তির মালিকানা হলো প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, ব্যবহার ও হস্তান্তর করার অধিকার।
- সম্পদ যখন অনুসন্ধান ও ব্যবহারে রাখবে ততক্ষণ সে তার স্বত্ত্বাধিকারী বিবেচিত হবে (Azad 2010, 74-75)।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিজাত ও নৈসর্গিক সম্পদের (যাতে মানুষের কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়নি) ভোগ-ব্যবহারের বিষয়টি একটি দেশের বা অঞ্চলের সকল মানুষেরই সমান অধিকার রয়েছে। এর ওপর বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া মালিকানা বলবৎ হতে পারে না। সকল নাগরিকই নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সামগ্রী অবাধে গ্রহণ করতে পারে। সেজন্য কোনো মূল্য আদায় করতে কাউকে বাধ্য করা যেতে পারে না। কাজেই নদী পুকুরের পানি বা জঙ্গলের কাঠ, স্বভাবজাত বৃক্ষ গুল্মের ফলমূল ঘাস-তৃণলতা, আলো-বাতাস, অরণ্য ও মরূভূমির উন্মুক্ত জন্তু, পাখি, জমির উপরিভাগস্থ খনিজ সম্পদ, সুরমা, ন্যাপথা প্রভৃতির ওপর কারও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃত হতে পারে না। এ ধরনের যাবতীয় জিনিসই সকল নাগরিকের সম্মিলিত ও সর্বাধিকারসম্পন্ন সম্পদ। এটি সকল মানুষের মিলিত ব্যবস্থাধীন থাকবে এবং সকলের জন্য ব্যবহৃত হবে। সকলেই এ থেকে উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার লাভ করবে (Rahim 1987, 55-56)। আবূ খিদাশ রহ. আল্লাহর নবী ﷺ এর জনৈক মুহাজির সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রা. বলেন,

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- ثَلاَثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ فِى الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

আমি নবী ﷺ এর সাথে তিনবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ মুসলিমরা তিনটি জিনিসে সমানভাবে অংশীদারঃ পানি, ঘাস ও আগুন। (Abū Dāwūd 2015, 3477)

যেসব জিনিস নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয় এবং যা কারও ব্যক্তিগত ভোগাধিকারে বা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাধীনে ছেড়ে দিলে সর্বসাধারণের সমূহ অসুবিধা, কষ্ট বা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে, তা সবই সর্বজনীন মালিকানা সামগ্রী হিসেবে গণ্য হবে। সেই প্রারম্ভিক যুগেই খনিসমূহ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রয়্যালটি (অর্থ) ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে আসতে থাকে। ঐতিহাসিক ইবনু সাদ (১৬৮-২৩০ হি.) বলেন, বনু সালীমের খনিটি অধিকৃত হয় আবূ বকর রা. এর যুগেই এবং এর আমদানি বায়তুলমালে জমা করা হয়। কবলিয়া এবং জুহনিয়ার খনিসমূহ থেকেও আবূ বকরের কাছে প্রচুর মাল (রয়্যালটি) আসে (Yusufuddin 2005, 232)। 'আল্ মুগনী' গ্রন্থকার ইবন কুদামাহ্ (৫৪১-৬২০ হি.) লিখেছেন, সীমানা নির্দিষ্ট করার পর কেউ এসব জিনিসের মালিক হয়ে পড়লে সে তার ভোগাধিকার হতে অন্য লোকদেরকে বিরত ও বঞ্চিত করবে এবং জনগণ ভয়ানক অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হবে। এর ফলে আল্লাহ্ তাআলা যে জিনিসকে যে কাজের জন্য যে মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা সেই মর্যাদায় বর্তমান থেকে নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে না এবং তাতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হবে। খনিজ সম্পদ, ভূপৃষ্ঠের উপরিউস্থ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ যে জন্য বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না তাও ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত হতে পারে না। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন, যেসব জমির উপরিভাগস্থ খনিজ সম্পদ আহরণ করায় বিশেষ কোনো শ্রম বা প্রচুর পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের আবশ্যক হয় না, তা কারও ব্যক্তিগত মালিকানায়

ছেড়ে দিলে সর্বসাধারণ মুসলমানের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হবে। অতএব, বর্তমান সময়ে সকল খনিজ সম্পদই এ নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায়, জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে (Rahim 1987, 57)।

মালিকি মাযহাবে একটি প্রসিদ্ধ মত হলো, যা মাটির গর্ভ থেকে বের হবে তা তামা ধরনের কঠিন হোক-কি তরল, তা সবই বায়তুলমালের মালিকানাভুক্ত হবে। জমির গর্ভ থেকে প্রাপ্ত পেট্রোলও রাষ্ট্রমালিকানায় চলে যাবে। কেননা সর্বসাধারণ মুসলমানের কল্যাণ এতেই নিহিত যে, এই সম্পদ সমষ্টির মালিকানা হবে, ব্যক্তিগত নয়। এসব মহামূল্যবান সম্পদ অনৈতিক ব্যক্তিদের হস্তগত হলে চরম অকল্যাণ ডেকে আনবে। তা নিয়ে জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতও হয়ে যেতে পারে। তাই তা মুসলিম নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় সরকারের ব্যবস্থাধীন থাকতে হবে এবং তার কল্যাণ সাধারণভাবে সকলের মধ্যে বিতরিত হতে হবে (al-Qarḍāwī 2013, 1:392)। এ মতের পক্ষে দলীল হলো নিম্নোক্ত হাদীস।

أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سَدِّ مَأْرِبٍ . فَأَقْطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ . فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ . فَقَالَ قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ

আবয়াদ ইবনে হাম্মাল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ্দ মা'রিব নামক লবণ খনিটি জায়গিররূপে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে সেটি জায়গিররূপে দান করলেন। অতঃপর আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলী যুগে আমি লবণের খনিটিতে গিয়েছিলাম। ঐ এলাকায় কোন পানি নাই। যে ব্যক্তিই সেখানে যায় সে-ই কিছু লবণ সংগ্রহ করে নেয়। তা প্রবাহিত পানির মতই পর্যাপ্ত। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আবয়াদ বিন হাম্মালের নিকট লবণের চুক্তির প্রত্যাহার চাইলেন। আবয়াদ ইবনে হাম্মাল বললেন, আমি আপনার সাথে চুক্তি রদ করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, সেটিকে আপনি আমার পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তা তোমার পক্ষ থেকে দান হিসাবেই গণ্য হবে। আর তা প্রবহমান পানির ন্যায়, যে-ই সেখানে যাবে তা নিতে পারবে। (Ibn Mājah 2015, 2475)

আবূ উবাইদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নবী করীম ﷺ তা মৃত অনাবাদী জমি হিসেবেই লিজ দিয়েছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, আবয়াদ তা পুনরুজ্জীবিত ও আবাদ করবেন। কিন্তু পরে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তা আটকে থাকা পানি, প্রবাহমান ঝর্ণার মতো নয়, তখন তার কাছ থেকে ফেরত নিলেন। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত ঘাস, আগুন ও পানির ক্ষেত্রে সব মানুষই সমানভাবে শরীক হবে। তাই তা মাত্র একজনের কর্তৃত্বে ছেড়ে দিয়ে তা থেকে অন্যদের বঞ্চিত করাকে পছন্দ করতে পারেননি (al-Qarḍāwī 2013, 1:392)।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে বলা যায়, যেসব সম্পদ সকল নাগরিকের জন্য অপরিহার্য সেগুলো কোনোভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন করা যাবে না। এসব সম্পদের মালিক হবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আমানাতদার হিসেবে জবাবদিহির শর্তে জনগণের কল্যাণে স্বচ্ছতার সঙ্গে এসবের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে খনিজ সম্পদ ব্যবহারের নীতিমালা

ইসলামে আয় ও সম্পদ বণ্টনের মূলনীতি খুব স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। মানবজাতি এর ভোগাধিকার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমানতদার মাত্র। আর ইসলামী অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষের সম্পদের ভোগ ও ব্যবহারের অধিকার দিয়ে ঘোষণা করেছেন:

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদে 'খলীফা' নিযুক্ত করেছেন, তা হতে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার। (al-Qur'ān, 57:7)

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখেছেন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর তরফ থেকে ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ ব্যয় ও ব্যবহার করার জন্য খলীফা বানিয়েছেন, যদিও তোমরা এর প্রকৃত মালিক নও। (Rahim 1987, 63)

ইসলামের সার্বিক নীতিমালার দিকে লক্ষ্য করে খনিজ সম্পদ ব্যবহারে ইসলামের মূলনীতিকে নিম্নোক্ত পয়েন্টে উল্লেখ করা যায়। যেমন:

- খনিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করা। ইসলামে পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে অন্যতম হলো যাকাত। খনিজ সম্পদের যাকাতের বিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

  হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত পবিত্র জিনিস এবং আমি যা কিছু তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করে দেই তা থেকে ব্যয় কর। (al-Qur'ān, 2:267)

উক্ত আয়াতে জমি থেকে বের করা সম্পদ বলতে প্রোথিত সম্পদ বা খনিজ সম্পদ বোঝানো হয়েছে। কেননা ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশে অপার মহিমায় আল্লাহ বিবিধ সম্পদ রেখে দিয়েছেন। খনিজ সম্পদের যাকাতের বিধান সম্পর্কে আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। (al-Bukhārī 2015, 2355)

- খনিজের সঠিক ব্যবহার করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অবৈধ ভোগ-ব্যবহারের পরিণাম ভয়াবহ

বলে সতর্ক করেছেন। খাওলা বিনত কায়স রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ

এ পার্থিব ধন-সম্পদ হলো সবুজ-শ্যামল ও মনোরম। যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে তার প্রয়োজন মত তা গ্রহণ করে, তার জন্য সে সম্পদে বরকত দেয়া হয়। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ ও রাসূলের দেওয়া এ সম্পদ স্বেচ্ছাচারী পন্থায় ভোগ-ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। (al-Tirmidhī 2015, 2374)

- অপচয় ও অপব্যবহার না করা। ইসলামে সম্পদকে নিজের মনে করে অপচয় ও অপব্যবহার কিংবা আত্মসাৎ করার অধিকার কাউকে দেয়নি। সম্পদ ব্যবহারে অন্যতম মূলনীতি হলো অপচয় ও অপব্যবহার না করা। বিশেষত খনিজ সম্পদের সুষম ব্যবহারে জনকল্যাণের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

তোমরা সম্পদের অপচয় করো না, অপচয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (al-Qur'ān, 6:141)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (al-Qur'ān, 17:27)

উপর্যুক্ত আয়াত দু'টিতে 'ইসরাফ' ও 'তাবযীর' শব্দ এসেছে। ইসরাফ অর্থ অপচয়, অতিরিক্ত ব্যয়, বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু ব্যয় করা, নষ্ট করা। সীমা অতিক্রমের সাথে অপচয় করা। আর তাবযীর মানে অপব্যয় করা। কোনো বস্তুকে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যয় না করে ভিন্ন খাতে ব্যবহার করা, হারাম খাতে ব্যবহার করা, অপব্যবহার করা ইত্যাদি।

সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে মধ্যম নীতি অবলম্বন করা। মিতব্যয়িতা ও অর্থব্যয়ের মধ্যম নীতি অবলম্বন করলে আর্থিক উপায়-উপাদান ব্যবহার করার ব্যাপারে সংকীর্ণতা বা বাড়াবাড়ি-কৃপণতা বা অপচয় করে ধন-সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্য নষ্ট হবে না। এ ব্যাপারে আল কুরআনের বাণী:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

(রহমানের বান্দা তারা) যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও অযথা খরচ করে, না কোনোরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এ উভয় দিকের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে। (al-Qur'ān, 25:67)

- খনিজ সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ অর্জন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পদ বণ্টনের গুরুত্ব তার চেয়ে বেশি। সম্পদ মুষ্টিমেয়

বিত্তবানদের হাতে পুঞ্জীভূত না করে তা সমাজের বেশির ভাগ মানুষের কাজে লাগানোর ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...﴾

যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না হয়... (al-Qur'ān, 59:7)

এজন্য সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন ও সঞ্চালনে ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন, সুযোগের পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামে রয়েছে সুষম নীতি। ইসলাম সম্পদের সমবণ্টনের (equal distribution) পরিবর্তে ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের (fair distribution) ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। বর্তমান বিশ্বে খনিজ সম্পদ দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর আহরণ, উত্তোলন, নিরাপদ ও যৌক্তিক ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এজন্য ইসলামে সম্পদ ব্যয়-বণ্টনে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও জনকল্যাণকর নীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

মোটকথা, খনিজ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় ইসলামি অর্থনৈতিক মূলনীতিসমূহ- যথা: মধ্যমপন্থার নীতি, কর্মদক্ষতার নীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক কর্মধারায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশে দুই স্থানে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। তা হলো : স্থলে ও সমুদ্রে। নিম্নে উক্ত দুই স্থানে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

▪ স্থলে খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশের স্থলে খনিজ সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের ভূভাগের বেশিরভাগই বঙ্গীয় অববাহিকার (Bengal Basin) অন্তর্গত। দেশের উত্তর, উত্তরপূর্ব ও পূর্বাংশে এ অববাহিকা টারশিয়ারি যুগের ভাঁজযুক্ত পাললিক শিলাস্তর দ্বারা গঠিত (প্রায় ১২ভাগ)। উত্তরপশ্চিম, মধ্য-উত্তর ও মধ্য-পশ্চিমাংশে অববাহিকার প্রায় ৮ ভাগ প্লাইসটোসিন যুগে উত্থিত পলল এবং অবশিষ্ট ৮০ শতাংশ ভূভাগ অসংহত বালি, পলি ও কর্দম দ্বারা গঠিত হলোসিন যুগের সঞ্চয়ন দ্বারা আবৃত। বাংলাদেশে প্যালিওসিন মহাকালের তুরা স্তরসমষ্টিকে প্রাচীনতম উন্মুক্ত শিলাস্তর হিসেবে শনাক্ত করা গেছে। দেশের উত্তরপশ্চিমাংশে খননকার্য পরিচালনাকালে প্রাচীনতর শিলাস্তর- যেমন, মেসোজোয়িক ও প্যালিওজোয়িক স্তরসমষ্টি এবং প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান ভিত্তিস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূগর্ভের কোনো স্থানে সঞ্চিত খনিজ সম্পদের অবস্থান মূলত সংশ্লিষ্ট স্থানের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে সঞ্চিত বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসমূহ হচ্ছে- প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, নুড়িপাথর,

গন্ডশিলা (Boulder), কাচবালি, নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত বালু, চীনামাটি, ইটের মাটি, পিট এবং সৈকত বালি ভারি মণিক (Beach Sand Heavy Minerals)।

সূত্র : বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

দেশের অয়েল ও গ্যাস উইন্ডোর মধ্যে বিদ্যমান টারশিয়ারি বরাইল শিলাদল থেকে উৎপন্ন হয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস[২] ও খনিজ তেল। উৎপন্ন হওয়ার পর এ প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল উপরের দিকে বহু কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত শিলাস্তর ভেদ করে উত্থিত হয়ে নিওজিন ভুবন ও বোকাবিল স্তরসমষ্টির মধ্যস্থিত সুবিধাজনক বেলেপাথর আধারে সঞ্চিত হয়। নুড়িপাথর, কাচবালি, নির্মাণ বালি, পিট ও সৈকত বালি প্রভৃতি খনিজ হলোসিন পাওয়া যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র পাহাড়সমূহে বিদ্যমান

২. বর্তমানে বাংলাদেশে ২৯টি চলমান প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে। প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে এবং সর্বশেষ গ্যাসক্ষেত্র ইলিশা-১, ভোলা জেলা। প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু ১৯৫৭ সালে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাসক্ষেত্র। গ্যাসক্ষেত্রসমূহ পরিচালনা করছে পেট্রোবাংলার অধীন বাপেক্স, বিজিএফসিএল, এসজিএফএল এবং আইওসি'স।

প্লাইসটোসিন পললে পাওয়া যায় চীনামাটি বা কেওলিন। দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের অল্প গভীরতায়ও চীনামাটি ও কাচবালির মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে। সীমিত মাত্রার উত্তোলনের মাধ্যমে চুনাপাথর, নির্মাণ বালি, কাচবালি, নুড়িপাথর, চীনামাটি ও সৈকত বালি আহরণ করা হচ্ছে। অন্তর্ভূপৃষ্ঠীয় মজুত থেকে চীনামাটি ও কাচবালি এখনও উত্তোলন করা হয়নি। তবে অন্তর্ভূপৃষ্ঠীয় কয়লা ও কঠিন শিলা উত্তোলনের কাজ এগিয়ে চলেছে (Banglapedia 2014)। সিলেট গ্যাসক্ষেত্রের ১০ নম্বর কূপ খনন করে প্রথম স্তরে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরীক্ষামূলকভাবে প্রতি ঘণ্টায় ৩৫ ব্যারেল তেলের প্রবাহ পাওয়া গেছে (Prothom Alo, 10 Dec. 2023)। বাংলাদেশের আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে-কয়লা, পিট, চুনাপাথর, সাদা কাদামাটি, হার্ডরক, কাচের বালি, নুড়ি জমা, লৌহ আকরিক, ভারী খনিজ, ভারী খনিজ বালি, নুড়ি মিশ্রিত বালি, ধাতব খনিজ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা উপর্যুক্ত মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। খনিজের ধরন ও প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন এলাকাকে খনিজসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। কয়েকটি খনিজ দ্রব্যের এলাকা চিহ্নিত করে গেজেটও প্রকাশিত হয়েছে।[৩] বাংলাদেশে মজুত খনিজ সম্পদের বাজারমূল্য নিরূপণ করেছে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, দেশে প্রাকৃতিকভাবে মজুত খনিজ সম্পদের মূল্য ২ দশমিক ২৬ ট্রিলিয়ন (২ লাখ ২৬ হাজার কোটি) ডলারের বেশি। বাংলাদেশী মুদ্রায় এর পরিমাণ ২৪১ দশমিক ৯৭ ট্রিলিয়ন (২ কোটি ৪১ লাখ ৯৭ হাজার ৩০০ কোটি) টাকা। তবে জিএসবি'র এ হিসাবে দেশে মজুত প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যকে ধরা হয়নি। জিএসবি'র হিসাবের সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যকে বিবেচনায় নেওয়া হলে দেশে মজুত খনিজ সম্পদের নিরূপিত মূল্য আরো কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার বাড়তে পারে। দেশের অভ্যন্তরে খনিজ সম্পদের প্রকৃত মজুত, প্রমাণিত মজুত ও রিজার্ভের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পরীক্ষা করা হয়নি বলে জানিয়েছে জিএসবির (Bonik Barta, 27 Jun. 2023)।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে এসব গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক ২০৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, আমদানিকৃত এলএনজি থেকে দৈনিক গড়ে ১০৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়। বাংলাদেশের মোট ব্যবহৃত গ্যাসের খাতওয়ারি হার হচ্ছে- বিদ্যুৎ উপাদন ৪১%, সার ৬%, বাণিজ্যিক ও চা ১%, সিএনজি ৪%, আবাসিক ১১%, ক্যাপটিভ ১৮% এবং শিল্প ১৯% (EMRD, Annual Report 2022-2023)।

৩. এসব গেজেটের মধ্যে রয়েছে: সাধারণ পাথর/বালি মিশ্রিত পাথর (বাংলাদেশ গেজেট, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, প্রজ্ঞাপন, ১৪ মার্চ ২০১৩), সিলিকা বালু (বাংলাদেশ গেজেট, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, প্রজ্ঞাপন, ২৭ জুন ২০১৩), সাদামাটি/চীনা মাটি (বাংলাদেশ গেজেট, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, প্রজ্ঞাপন, ২০ জুন ২০১৩), খনিজ বালু (বাংলাদেশ গেজেট, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, প্রজ্ঞাপন, ৩১ অক্টোবর ২০১৩)।

গ্যাস বিতরণে সরকারের ০৬টি কোম্পানি নিয়োজিত আছে।[৪] দেশে কয়লা ও গ্রানাইট খনিজ পদার্থও উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে। ২০০৫ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৩.৭৮৯ মি. টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে (BCMCL, Annual Report 2022-2023)। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং থেকে ২০০৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৪৬.৮৩ লক্ষ মে. টন পাথর উৎপাদিত হয়েছে (MGMCL, Annual Report 2022-2023)। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কাজ করে যাচ্ছে (BMD, Annual Report 2022-2023)।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, গৃহস্থালী, যানবাহন প্রভৃতি সেক্টরে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদের ব্যবহার ব্যাপক। যেমন-প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম, সিএনজি[৫] ও এলপিজি[৬] যানবাহন ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হয়। শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস, এলএনজি[৭], চুনাপাথর, প্রস্তর, রাসায়নিক পদার্থ কাঁচামাল ও জ্বালানি হিসেবে এবং অন্যান্য শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপজাত (by product) এনজিএল ও কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেট করে এলপি গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেল, অকটেন, এমটিটি, কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। এছাড়া, মূল্যবান সোনা, রূপা, তামা, হীরা, মণি-মুক্তা অলংকার তৈরিতে কাজে লাগে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বিসিএসআইআর) গবেষণায় গাইবান্ধায় জয়পুরহাটের ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চলের বালুতে মিলেছে ছয়টি মূল্যবান খনিজ পদার্থ। ওই ছয় খনিজ পদার্থ হলো-রুটাইল, জিরকন, ম্যাগনেটাইট, গারনেট, ইলমিনাইট ও কোয়ার্টজ। ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চলের বালুতে পাওয়া এসব খনিজ উপাদানে চুম্বক, ইস্পাত, সিরিশ কাগজ, প্লাস্টিক, ওয়েলডিং রড, কসমেটিকস, টাইলস, রিফ্যাক্টরিজ ও ওষুধ উৎপাদন করা যাবে। খনিজ সম্পদগুলোর দাম প্রায় পৌনে চার হাজার কোটি টাকা। এছাড়া এসব ব্যবহৃত হবে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে।

৪. সরকারের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অধীন ৬টি কোম্পানি সারা দেশে গ্যাস নেটওয়ার্ক ও অঞ্চলভিত্তিক গ্যাস বিতরণ করে থাকে। কোম্পানিসমূহ হল- তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানী লি., জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লি. বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি.সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লি. এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লি.।

৫. CNG-Compressed Natural Gas-সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস

৬. LPG-Lequified Petroleum Gas-তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস যা বাণিজ্যিক বিউটেন, বাণিজ্যিক প্রোপেন এবং উভয়ের মিশ্রণ। এলপি গ্যাস গৃহস্থালী কাজে, যানবাহনে এবং শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

৭. এলএনজি- প্রাকৃতিক গ্যাসকে -১৬০ ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রা ও ১ বায়ুচাপে রেফ্রিজারেসন প্রক্রিয়ায় তরল করে এলএনজি (Liquefied Natural Gas) পাওয়া যায়। এলএনজির প্রধান উপাদান মিথেন। তবে, সামান্য পরিমাণ ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, পেন্টেনসহ অন্যান্য হাইড্রোকার্বন মিশ্রিত থাকে।প্রাকৃতিক গ্যাস-কে এলএনজিতে রূপান্তর করলে এর আয়তন সংকুচিত হয়ে ৬০০ গুণ কমে যায়। বাংলাদেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এলএনজি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এরমধ্যে রয়েছে খনি থেকে উত্তোলিত কয়লা পরিষ্কার করা, তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে গভীর কূপ খনন, লোহাজাতীয় পাইপ পরিষ্কার করা এবং বালুতে বিস্ফোরণ ঘটানো (Newsbangla24, 6 Mar. 2024)।

▪ সমুদ্রে খনিজ সম্পদ

সমুদ্র থেকে আহরণকৃত যে সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তা-ই সমুদ্রসম্পদ। সামুদ্রিক সম্পদের বিপুল সম্ভাবনার জন্যই মানুষ এর তলদেশে অবস্থিত সকল প্রকার সম্পদ আহরণে উৎসাহী হয়ে থাকে। সমুদ্রসম্পদ যথাযথ কাজে লাগানোর জন্য বর্তমান পৃথিবীতে 'ব্লু-ইকোনমি'[৮] এর ধারণা ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিজয়ের ফলে ব্লু-ইকোনমির ক্ষেত্রে দুই ধরনের সম্পদ অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রাণিজ, আরেকটি হলো অপ্রাণিজ। অপ্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে খনিজ ও খনিজজাতীয় সম্পদ যেমন: তেল, গ্যাস, চুনাপাথর প্রভৃতি। এছাড়াও ১৭ ধরনের মূল্যবান খনিজ বালি। যেমন: জিরকন, রুটাইল, সিলিমানাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গ্যানেট, কায়ানাইট, মোনাজাইট প্রভৃতি, যার মধ্যে মোনাজাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র সৈকতের বালিতে মোট খনিজের মজুত ৪৪ লাখ টন। প্রকৃত সমৃদ্ধ খনিজের পরিমাণ প্রায় ১৭ লাখ ৫০ হাজার টন, যা বঙ্গোপসাগরের ১৩টি স্থানে পাওয়া গেছে (Choudhury 2022)।

সারা পৃথিবীর তিনভাগ জুড়ে কেবল পানি আর পানি। অবশিষ্ট একভাগ মাত্র স্থল। ভূপৃষ্ঠ যদি সর্বত্র সমতল হতো তাহলে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি দিয়ে ভূপৃষ্ঠ দুই মাইল পানির নিচে তলিয়ে থাকতো। এ বিশাল জলরাশি মহাসাগর, সাগর, নদ-নদী, খাল-বিল, প্রণালী, পুকুর-দীঘি, হাওড় ইত্যাদিতে জমা থাকে। এর মধ্যে সাগর-মহাসাগরে অতল দেশে রয়েছে বিপুল সম্পদ। সাগরের তলদেশে রয়েছে মণি-মুক্তা, খনিজ সম্পদ ম্যাঙ্গানিজ, তামা, সীসা, বেরিয়াম, মলিবডেনাম, তেল ও মৎস্য, শৈবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য (Mridha 1995, 23)।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যেসব মূল্যবান খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা যথাযথভাবে আহরণ ও ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে দারুণ উন্নতি সাধিত হবে। এক ইউরেনিয়াম দিয়েই বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে। এর সাথে অন্যান্য খনিজ সম্পদ যুক্ত হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচক ঊর্ধ্বগতিতে অগ্রসর হবে। এছাড়া, বিভিন্ন সেক্টরে জ্বালানি সরবরাহ, শিল্পের উন্নয়ন,

৮. ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি হচ্ছে সমুদ্রের সম্পদনির্ভর অর্থনীতি। অর্থাৎ সমুদ্র থেকে আহরণকৃত যে কোনো সম্পদ, যা দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়, তাই ব্লু-ইকোনমির পর্যায়ে পড়বে। সাধারণভাবে বলা যায়, সামুদ্রিক পরিবেশ ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে অর্থনীতি গড়ে ওঠে তা হলো সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু-ইকোনমি। ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম অধ্যাপক গুন্টার পাওলি তাঁর বিখ্যাত 'The Blue Economy 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs' বইয়ে ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কে ধারণা প্রদানপূর্বক সমুদ্র অর্থনীতির মডেল প্রস্তাব করেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে খনিজ সম্পদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাই পালন করে না, বরং চালিকা শক্তির আসনে বসে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করে। বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদ প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের মজুত সীমিত বলে ধারণা করা হয়। আর্থ-কারিগরি দিক বিবেচনায় দেশের অভ্যন্তরে ভূগর্ভস্থিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, অন্বেষণ, আহরণ ও উত্তোলন বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়। বর্তমান বিশ্ব জ্বালানি পরিস্থিতি সংকটময়। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের খনিজ সম্পদসমূহের অধিকাংশই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুরের খনি থেকে কয়েকবছর ধরে কয়লা ও গ্রানাইট পাথর উত্তোলন চলছে। অন্যান্য এলাকার খনি ও কোয়ারিসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে বলে প্রতীয়মান। দক্ষ জনশক্তি ও উন্নত প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমুদ্র থেকে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন ও আহরণের উদ্যোগ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গ, জামালগঞ্জ, নেত্রকোণা, সিলেট, কক্সবাজার ও অন্যান্য স্থানের খনিজ সম্পদ আহরণে আধুনিক প্রযুক্তি ও আর্থিক সক্ষমতা এখনও তৈরি হয়নি। এছাড়া, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সমুদ্রসম্পদ আহরণে সমুদ্র উপকূলীয় অগভীর অঞ্চলে খনন কাজ করা হলে মৎস্য সম্পদ, মৎস্যক্ষেত্র, মৎস্য প্রজনন ও পরিচর্যা, লবণাক্ত জলাভূমির ইকোসিস্টেম, প্রবাল ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম, উপকূলীয় পর্যটন, লবণশিল্প, জনজীবন ও জনস্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে।

তবে আশার কথা হলো, খনিজ সম্পদ আহরণে বাস্তবমুখি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে জ্বালানি অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। শিল্পকারখানা সচল রাখতে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। আরও দুইটি এলএনজি এফএসআরইউ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। একটি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনেরও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জ্বালানির সংকট মোকাবিলায় দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বাড়াতে ৪৮টি কূপ খননের কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি ২০২৮ সালের মধ্যে আরও ১০০টি কূপ খনন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (The Business Standard, 10 Mar. 2024)।

সম্প্রতি সরকার 'Identification and Economic Assessment of the Valuable Minerals in the River Sands of Bangladesh' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল,

সিলেট, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং ভোলার নদী এলাকায় বালিতে দুর্লভ, মূল্যবান এবং কৌশলগত মৌল ও খনিজের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে উঠবে। এর মাধ্যমে খনিজ সম্পদসমূহ আহরণ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি সাধারণ বালির দামে অতি মূল্যবান বালি বিক্রয় বা ব্যবহাররোধ করাও সম্ভব হবে যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প এলাকার নদীবক্ষ হতে বালির নমুনা নিয়মতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হবে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পরীক্ষাগারে বালির নমুনার পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকৃত মূল্যবান খনিজ সমৃদ্ধ বালি, অতি মূল্যবান ধাতব খনিজ, বিরল ধাতু ও অতি মূল্যবান তেজস্ক্রিয় মৌলের মজুত শনাক্তকরণ করা হবে। চিহ্নিত খনিজ বালির মোড অব ডিস্ট্রিবিউশন, মজুত এবং উৎস সংশ্লিষ্ট মানচিত্র প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।[৯] উপর্যুক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ এগিয়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনে উদ্যোগী হলে তা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বড় উৎস হতে পারে। চলমান জ্বালানি সংকটের সমাধানসহ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আশা করা যায়, বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। এতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হবে এবং ব্যাপক কর্মস্থান সৃষ্টি হবে।

খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রচলিত আইন ও বিধিমালা

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন হিসেবে খনি ও খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নকল্পে 'খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২' প্রণীত হয়, যা বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা হিসেবে ১ নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এ আইনে ৭টি ধারা রয়েছে। এ প্রবন্ধে সকল ধারা-উপধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবে, আইনের সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ধারা-১ : এ আইনের শিরোনাম;
ধারা-২ : এ আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা, যেমন-অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স, খনিজ সম্পদ, খনি, ভূমি ইত্যাদি;
ধারা-৩ : অনুসন্ধান ও অন্বেষণ লাইসেন্স ও খনি ইজারা ইত্যাদি;
ধারা-৪ : বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা;
ধারা-৫ : দণ্ড;
ধারা-৬ : অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা এবং
ধারা-৭ : রহিতকরণ ও হেফাজত সম্পর্কিত।

উপর্যুক্ত আইনটি সংক্ষিপ্ত হলেও ২০১২ সালে এর আলোকে বিধি প্রণীত হয়। এর নাম 'খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২' নামে অভিহিত, যা বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা হিসেবে ৩ জুন ২০২২ তারিখে এসআরও নম্বর ১৪৩-আইন/২০১২

৯. বিস্তারিত : বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)। ওয়েবসাইট: www.gsb.gov.bd

প্রকাশিত হয়। এ বিধিমালায় ৫টি অধ্যায়ে ৯৯টি ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিধিমালায় আইন কার্যকরে বিস্তৃতভাবে তপশিলসহ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীসময়ে ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে উক্ত বিধির কতিপয় বিধি প্রয়োগে জটিলতা ও অস্পষ্টতা থাকায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়। বিধির সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- প্রথম অধ্যায়: সাধারণ
- দ্বিতীয় অধ্যায়: অনুসন্ধান লাইসেন্স
- তৃতীয় অধ্যায়: খনি ইজারা
- চতুর্থ অধ্যায়: কোয়ারী ইজারা
- পঞ্চম অধ্যায়: বিধি

উক্ত বিধিতে ১৪টি তফশিল সংযুক্ত আছে। এ বিধি কার্যকরের মাধ্যমে 'The Mines and Minerals Rules, 1968' রহিত করা হয়।

ইসলাম ও প্রচলিত আইনের তুলনা

ইসলামী নীতি ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মূলনীতিগত দিক থেকে প্রচলিত আইন ও ইসলামী দিক-নির্দেশনার মধ্যে তেমন কোনো ফারাক নেই। যেমন:

আর্থ-সামাজিক কল্যাণে খনিজ সম্পদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। বাংলাদেশের খনি ও খনিজ সম্পদ আহরণ, উত্তোলন এবং ব্যবহারের ওপর আইন ও বিধিতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামেও খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে থাকে। বিদ্যমান আইনে রয়্যালটি রয়েছে। তবে, ইসলামের আলোকে খনিজে 'খুমুস' বা এক পঞ্চমাংশ প্রযোজ্য হবে। এ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র ১/৫ অংশ আদায় করে যাকাত হিসেবে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করবে।

'খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২'-এ খনিজ সম্পদের একটি বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ভূগর্ভে লুক্কায়িত 'রিকায'-কে খনিজ সম্পদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ভূমিতে বা জলে প্রাপ্ত খনিজ, ধনসম্পদ বা রত্নভাণ্ডার সবকিছুই রিকায বা মা'দিনের অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত আইনের ধারা-৩ অনুসারে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে খনিজ সম্পদ এলাকা চিহ্নিত হলে তার কাছ থেকে উপযুক্ত বিনিময়মূল্য দিয়ে অধিগ্রহণ করা হয়ে থাকে। আইনের বিধির অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনও পন্থায় অনুসন্ধান বা অন্বেষণ লাইসেন্স বা খনি ইজারা ও সুবিধা প্রদান করা যায় না।

হাদীসে দেখা যায়, আল্লাহর নবী ﷺ 'সাদ্দ মা'রিব' নামক লবণ খনিটি একজন সাহাবীকে লিজরূপে দান করলেও যখন জানতে পারলেন এটি একটি খনি, তখন তা প্রত্যাহার করে নিলেন। তবে আল্লাহর রাসূল ﷺ তার নিকট থেকে সেটি ফেরত নেওয়ার বিনিময়ে তাকে অন্যস্থানের এক খণ্ড কৃষিভূমি ও একটি খেজুর বাগান লিজরূপে

দান করেন। অর্থাৎ খনি ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও উত্তোলনে জনগণের স্বার্থে অধিগ্রহণ করলে এর বিনিময় দান করার বিধান রয়েছে। খনিজ ব্যক্তি মালিকানাধীন হলে তার কাছ থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই তাকে সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

আইনের ধারা-৪ অনুসারে একটি বিধি প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা ছিল। তদনুযায়ী ২০১২ সনে 'খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২' নামে বিধি জারি হয়। উক্ত বিধির প্রথম অধ্যায়ে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান লাইসেন্স বা ইজারার জন্য আবেদন, এর প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়, সীমানা চিহ্নিতকরণ, ভূমি গ্রহণ সংক্রান্ত, কর, ফি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কর্মসময়, বিস্ফোরক ব্যবহার, খনিজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, কর্মীদের ক্ষতিপূরণ, খনিজ সম্পদ অপসারণ, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুসন্ধান লাইসেন্স সম্পর্কিত, তৃতীয় অধ্যায়ে খনি ইজারা, কারিগরি জনবল, রয়্যালটি পরিশোধ, হিসাব সংরক্ষণ, উৎপাদন রিটার্ন দাখিল, পরিকল্পনা, কাজের বাধ্যবাধকতা, পরীক্ষণ পরিমাপ, অসংরক্ষিত খনি কার্যক্রম, গাছ কাটা ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কোয়ারি (এরূপ স্থান, যেখানে ভূমির উপরিভাগে বা উপরিভাগের স্তরে প্রাকৃতিকভাবে খনিজ বা শিলা জমা রয়েছে এবং যেস্থান থেকে খনন ব্যতীত বা সর্বোচ্চ পাঁচ মিটার উলম্ব গভীরতায় খনিজ পাওয়া যায়) ইজারা সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিধির অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা ইজারার ক্ষেত্রে সরকারের অধিকার সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তবে, ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হবে।

খনি ও খনিজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে উপরিউক্ত বিধানাবলি জনকল্যাণ (مصلحة) হিসেবে বিবেচনায় করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিবেশ অনুকূলে রাখার বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। কর্মী বা শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি পরিশোধে তাগাদা করা হয়েছে। যে কোনো বৈধ সম্পদ বৈধ উপায়ে আহরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষত, ব্যক্তি মালিকানাধীন খনিজ সম্পদ ব্যবহারে এক পঞ্চমাংশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইজারা প্রদানের বিষয়ে ইসলামে নির্দেশনা রয়েছে। ইজারা একটি শরী'আহসম্মত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কঠোরতা আরোপ করা সমীচীন নয়। তেমনি সামগ্রিক নীতিতে 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান, ক্লেশ চান না'[১০] এ পদ্ধতি প্রয়োগ হতে পারে। ব্যক্তি বা সম্পদের যাতে ক্ষতি সাধিত না হয় সেবিষয়েও ইসলামে তাৎপর্যপূর্ণ বিধান রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামে খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ খনিজ

১০. আল্লাহর বাণী : ﴿ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴾ অর্থ: আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না (al-Qur'ān, 2: 185)

সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের ভারসাম্যপূর্ণ দিক-নির্দেশনাও প্রদান করেছেন। মূলত, সম্পদের প্রকৃত মালিকানা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার। মানুষ আল্লাহ্‌র দেওয়া মাল পেয়েছে দান হিসেবে। সেই সাথে পেয়েছে সেই মালের ভোগ ব্যবহার ও বিলি-বণ্টনের বৈধ নিয়ম। ইসলামী শরীআহ অপচয়রোধে দৃঢ়তা দেখায়। কোনোক্রমেই সম্পদ অপচয় করা যাবে না। ইসলামী নীতিতে ব্যয় ও ভোগ ব্যবহার কেবল বিত্তশালী শ্রেণির স্বার্থ হতে পারবে না। বরং সাধারণ ও দুর্বল শ্রেণির কল্যাণে সার্বিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুপারিশমালা

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, আহরণ, বিতরণ এবং প্রকৃত ব্যবহারের মাধ্যমে এর সুষম উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আবশ্যক দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নে নিম্নোক্ত কয়েকটি মৌলিক সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে:

১. সমগ্র বাংলাদেশে সম্ভাব্য খনিজ-সমৃদ্ধ এলাকা চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক জরিপ এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম বৃদ্ধির পাশাপাশি খনিজ সম্পদ সঠিকভাবে ম্যাপ করতে স্যাটেলাইট ইমেজিংসহ বিদ্যমান ভূতাত্ত্বিক ডেটা ডিজিটালাইজকরণ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. খনিজ সম্পদের টেকসই উন্নয়নের জন্য খনিজ অনুসন্ধান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা দরকার।

৩. ভূমি ও সমুদ্রে খনিজ অনুসন্ধান, আহরণ, উত্তোলন এবং নিষ্কাশনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মূলধনকে কাজে লাগাতে অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক খনি কোম্পানি এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলে যৌথ উদ্যোগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। খনিজ সম্পদ আহরণে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

৪. ইসলাম সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, উত্তোলন, নিরাপদ ও যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে ইসলামী নীতি অবলম্বনে জাতীয় খনি ও খনিজ নীতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সার্বিক উন্নয়নে আহরিত খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত রয়্যালটি/যাকাত আদায় করে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা আবশ্যক।

৫. খনিজ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পন্থায় ইসলামী অর্থনৈতিক মূলনীতিসমূহ-যথা ই'তিদাল বা মধ্যমপন্থার নীতি, কর্মদক্ষতার নীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার অনুযায়ী অপচয়-অপব্যয়রোধে জনকল্যাণমূলক কর্মধারায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তাআলা মানবজাতির অস্তিত্ব, জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের জন্য দান করেছেন মানবোপযোগী প্রাকৃতিক বিশ্বপরিবেশ। আর এ বিবেচনায় মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত। তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণে এ পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়ে এসব সম্পদ আয়ত্তে আনার জন্য মানুষকে যে সক্ষমতা, কৌশল ও জ্ঞান দান করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করা অত্যন্ত অপরিহার্য। খনিজ সম্পদ আহরণ, উত্তোলন, মজুত ও ব্যবহার বিষয়ে ইসলামের মৌল নীতিমালা অনুসৃত ও অনুশীলিত হলে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। খনিজ সম্পদ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত বা হক বাবদ আদায়কৃত অর্থ দ্বারা অনগ্রসর নাগরিক ও মানবকল্যাণে ব্যয় করলে দারিদ্র্য দূর হবে। সমগ্র দেশের অর্থনীতির চাকাও সচল হবে। খনিজসম্পদের অপচয়-অপব্যয়রোধ, মধ্যপন্থা অবলম্বন, যথাযথ ক্ষেত্রে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণে ও স্বার্থে কর্মপন্থা নির্ধারণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে নিঃসন্দেহে সকলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abdur Rahim, Muhammad. 1987. *Islamer Orthoniti*. Dhaka: Khairun Prokashoni

- 2007, *Sroshta o Sristitotto,* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn Ash'ath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 2015. *Sunan Abī Dāwūd*.Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Ba'alabakī, Munīr. 1994. *al-Mawrid* English-Arabic Dictionary. Beirut: Dār 'Ilm lil Malāyyīn.

al-Ba'alabakī, Rūḥī. 1993. *al-Mawrid* Arabic-English Dictionary. Beirut: Dār 'Ilm lil Malāyyīn.

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2015. *al- Ṣaḥīḥ.* Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Qarḍāwī, Yūsuf. 2013. *Islamer Zakater Bidhan* (Translated by: Muhammad Abdur Rahim). Dhaka: Khairun Prakashani

al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā Ibn Sawratah Ibn Mūsā. 2015. *Sunan al-Tirmidhī*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Azad, Md. Abul Kalam. 2010, *Islami Orthonitir Aloke Aai o Sompod Bonton Bebontha*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Banglapedia, 2014. "Khonij Shompod"
http://bn.banglapedia.org/index.php?title=খনিজ_সম্পদ

Bates, R. L., & Jackson, J. A. 1980. *Glossary of Geology*. American Geological Institute

Choudhury, Jamil. 2016. *Bangla Academy Adhunik Bangla Abhidhan*. Dhaka: Bangla Academy

Chowdhury, Moazzem Hossain, 1996, *Prikritik Bhogul.* Dhaka: Bangladesh Book Corporation.

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd. 2015. *Sunan Ibn Mājah.* Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Lahiry, Arun Kumar. 2009. *Paribeshgato Provab Nirupon O Byabosthapana*. Dhaka: Bangla Academy

Mridha, Shahidullah. 1995. *Bangopsagor: Samudra Bigyan*. Dhaka: Bangla Academy

Mukhopadhya, Shibproshad, 1360 Bangla, *Aurthonoitik Bhogul.* Kolkata: H Chattarjee and Co. Ltd.

Siddiqui, Zillur Rahman 2012. *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*. Dhaka: Bangla Academy

Yusufuddin, Muhammad 2005, *Islamer Orthonoitik Motadorsho* (Trans. Abdul Matin Jalalabadi) Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Newspaper

Choudhury, Iftekhar Uddin. 2022. "Samudra Sompod Hote Pare Sommiddhir Onyatom Sopan" *Jugantor,* April 11.

The Daily Banik Barta, 27 Jun. 2023.
https://bonikbarta.net/home/news_description/345607/

The Daily Prothom Alo, 10 Dec. 2023.
https://www.prothomalo.com/bangladesh/zqy74me41z

Newsbangla24, 6 Mar. 2024.
https://www.newsbangla24.com/news/241181/Six-minerals-have-been-found-in-Gaibandha-by-BCSIR-at-Jaipurhat

The Business Standard, 10 Mar. 2024.
https://www.tbsnews.net/bangla/বাংলাদেশ/news-details-198206

Official Reports

BCMCL, Annual Report 2022-2023. www.bcmcl.org.bd

BMD, Annual Report 2022-2023.. www.bomd.gov.bd

EMRD, Annual Report 2022-2023. www.emrd.gov.bd

MGMCL, Annual Report 2022-2023. www.mgmcl.org.bd

RPGCL, Annual Report 2022-2023. www.rpgcl.org.bd